أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ظ)

www.motaher21.net

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই,

Let there be no compulsion in religion.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫৬

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন।

২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

এ আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। (ফাতহুল বারী ১/৩৭৭)

গ্রহণযোগ্য একটি বর্ণনা হল, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈকা মহিলার বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে মারা যেত। সে মহিলা মানত করল, এবার তার বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে জীবিত থাকলে তাকে ইয়াহূদী বানাবে। যখন বানী নাযীরকে দেশান্তর করে দেয়া হয় তখন তাদের মধ্যে কিছু আনসারদের সন্তান ছিল। আনসাররা বলল- আমরা আমাদের সন্তানদের যেতে দেব না। (বরং ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে এখানে রেখে দেব।) তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবাবে নুযূল, পৃঃ ৫৬, আবূ দাঊদ হা: ২৬৮২, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন)

ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ﴾ কাউকে জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করো না। ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে এবং এর দলীল প্রমানাদি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং জোর-জবরদস্তি কি প্রয়োজন? যাকে মহান আল্লাহ্ সুপথ প্রদর্শন করবেন, যার বক্ষ খুলে দিবেন, যার অন্তর উজ্জ্বল হবে এবং যার চক্ষু দৃষ্টিমান হবে সে আপনা আপনিই ইসলামের প্রেমে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু যার অন্তর-চক্ষু অন্ধ এবং কর্ণ বধির সে এর থেকে দূরে থাকবে। অতঃপর যদি তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা হয়, তাতেই বা লাভ কি? তাই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ‘কাউকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করো না।’

আয়াতটি অবতীর্ণের কারণ

এ আয়াতটির শান-ই-নুযূল এই যে, মাদীনার মুশরিকরা মহিলাদের সন্তান না হলে এই বলে ‘নযর’ মানতঃ ‘যদি আমাদের ছেলে-মেয়ে হয় তাহলে আমরা তাদেরকে ইয়াহূদী করে ইয়াহূদীদের নিকট সমর্পণ করবো।’ এভাবে তাদের বহু সন্তান ইয়াহূদীদের নিকট ছিলো। অতঃপর এ লোকগুলোও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং মহান আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যকারীরূপে গণ্য হয়। এদিকে ইয়াহূদীদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বাঁধে। অবশেষে তাদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করার নির্দেশ দেন। সেই সময় মাদীনার এই আনসার মুসলিমদের যেসব ছেলে ইয়াহূদীদের নিকট ছিলো তাদেরকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে এনে মুসলিম করার উদ্দেশে তাঁরা ইয়াহূদীদের কাছ থেকে ফেরত চান। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলা হয়ঃ

‘তোমরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করো না। নিশ্চয়ই বাতিল পথ হতে সৎপথের পার্থক্য পরিস্কার হয়ে গেছে। (হাদীস সহীহ। তাফসীর তাবারী -৫/৪০৮/৫৮১২, সুনান আবূ দাউদ-৩/৫৮/২৬৮২, সুনান নাসাঈ (কুবরা) -৬/৩৫৪/১১০৪৮, সহীহ ইবনু হিব্বান১/১৭৭/১৪০, সুনান বায়হাক্বী -৯/১৮৬) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) -ও তাদের গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৩/১৩২ ও ৬/৩০৪)

একটি বর্ণনায় আছে যে, আনসারদের বানূ সালিম ইবনু আওফ গোত্রের মধ্যে হুসাইন নামক একজন লোক ছিলেন। তিনি নিজে মুসলিম হলেও তার দু’টি ছেলে খ্রিষ্টান ছিলো। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট আবেদন করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তাঁকে অনুমতি দেন তাহলে ছেলে দু’টিকে তিনি জোরপূর্বক মুসলিম বানাবেন। কেননা তারা স্বেচ্ছায় মুসলিম হতে চায় না। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়। (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৫/৪০৯/৫৮১৭)

‘আলিমদের অনেকেই মনে করেন যে, এই আয়াতটি আহলে কিতাবদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যারা তাওরাত ও ইনজীলের রহিতকরণ ও পরিবর্তনের পূর্বে ‘ঈসা (আঃ) -এর ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। আর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়েছিলো।

কেউ কেউ বলেন যে, যুদ্ধের আয়াত এ আয়াতটিকে রহিত করেছে। এখন সমস্ত অমুসলমানকে এই পবিত্র ধর্মের প্রতি আহ্বান করা অবশ্য কর্তব্য। যদি কেউ এই ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করে এবং মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করে জিযিয়া প্রদানে অসম্মতি জানায় তবে অবশ্যই মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ﴾

‘তোমাদের যুদ্ধ করতে ডাকা হবে খুবই শক্তিশালী এক জাতির বিরুদ্ধে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে।’ (৪৮নং সূরাহ আল ফাতহ, আয়ত-১৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেনঃ
﴿يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾

‘হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো।’ (৯ নং সূরাহ আত তাওবাহ, আয়াত-৭৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

‘হে মু’মিনগণ! যে সব কাফির তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাতে তারা তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়। আর জেনে রেখো যে, মহান আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সাথে আছেন।’ (৯নং সূরাহ আত তাওবাহ, আয়াত-১২৩) সহীহ হাদীসে আছেঃ

عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ.

‘তোমার প্রতিপালক ঐ লোকদের ওপর বিস্মিত হোন যাদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে যুদ্ধের মাঠ হতে টেনে আনা হয়। অতঃপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং এর ফলে তাদের ভিতর ও বাহির ভালো হয়ে যায় এবং তারা জান্নাতের যোগ্য হয়ে যায়।’ (সহীহুল বুখারী-৬/১৬৮/৩০১০, সুনান আবূ দাউদ-৩/৫৬/২৬৭৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাঁর হাদীস গ্রন্থে আনাস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন লোককে বললেনঃ ‘মুসলিম হয়ে যাও।’ সে বলেঃ আমার মন চায়না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ মন না চাইলেও মুসলিম হও। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -৩/১০৯, ৩/১৮১, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ-৫/৩০৫) এই হাদীসটি ‘সুলাসী।’ অর্থাৎ মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতে তিনজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা মনে করা উচিত হবে না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বাধ্য করেছিলেন। বরং তাঁর এই কথার ভাবার্থ হচ্ছেঃ তুমি কালিমা পড়ে নাও, একদিন হয়তো এমন আসবে যে, মহান আল্লাহ্ তোমার অন্তর খুলে দিবেন এবং তুমি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তুমি হয়তো উত্তম নিয়ম ও খাঁটি ‘আমলের তাওফীক লাভ করবে।

তাওহীদ হলো ঈমানের মূল স্তম্ভ

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ ‘যে ব্যক্তি প্রতিমা বা মূর্তি, বাতিল উপাস্য ও শায়তানী কথা পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহ্র একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয় এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে সে সঠিক পথের ওপর রয়েছে। আবুল কাসীম আল বাগাবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ‘উমার (রাঃ) বলেনঃ যে, جِبْت শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে যাদু এবং طَاغُوْت শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে যা শায়তান। বীরত্ব ও ভীরুত্ব এ দু’ টি হচ্ছে উটের দু’ দিকের দু’ টি সমান বোঝা যা মানুষের মধ্যে রয়েছে। একজন বীর পুরুষ এক অপরিচিত লোকের সাহায্যার্থে জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। পক্ষান্তরে একজন কাপুরুষ আপন মায়ের জন্যও সম্মুখে অগ্রসর হতে সাহসী হয় না। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা হচ্ছে তার ধর্ম। মানুষের সত্য বংশ হচ্ছে তার উত্তম চরিত্র, সে যে বংশেরই লোক হোক না কেন। (তাফসীর তাবারী -৫/৪১৭/৫৮৩৪) ‘উমার (রাঃ) -এর طَاغُوْت-এর অর্থ ‘শায়তান’ নেয়া যথার্থই হয়েছে। কেননা সমস্ত মন্দ কাজই এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো অজ্ঞতা যুগের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। যেমন মূর্তি পূজা, তাদের কাছে অভাব অভিযোগ পেশ করা এবং বিপদের মুহূর্তে তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ﴾ সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল।’ অর্থাৎ ধর্মের সুউচ্চ ও শক্ত ভিত্তিকে গ্রহণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবে না। সুতরাং এ ব্যক্তি সুদৃঢ় অবস্থানে অবস্থান করবে এবং সরল সঠিক পথে অগ্রসর হবে। عُرْوَةِالْوُثْقٰى শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে, ঈমান, ইসলাম, মহান আল্লাহ্র একাত্মবাদ, কুর’ আন ও মহান আল্লাহ্র পথের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা পোষণ করা। এই রজ্জু তার জান্নাতে প্রবেশ লাভ পর্যন্ত ছিড়ে যাবে না। অন্য স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ﴾

‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।’ (১৩ নং সূরাহ্ আর রা ‘দ, আয়াত নং ১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ ধারণ করার জন্য শক্ত হাতল হচ্ছে ঈমান যা বিশ্বাস। (তাফসীর তাবারী ৫/৪২১)

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে, কায়িস ইবনু ‘উবাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ ‘আমি মাসজিদে নাবাবীতে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাঁর মুখমণ্ডলে মহান আল্লাহ্ভীতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। তিনি হালকাভাবে দুই রাক ‘আত সালাত আদায় করেন। জনগণ তাকে দেখে মন্তব্য করেনঃ এই লোকটি জান্নাতী। তিনি মাসজিদ হতে বের হলে আমিও তার পিছনে গমন করি। তার সাথে আমার কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলিঃ ‘আপনার আগমনকালে জনগণ আপনার সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করেছিলো। তিনি বলেনঃ সুবহানাল্লাহ! কারো এরূপ কথা বলা উচিত নয় যা তার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, এরূপ কথা তো অবশ্যই রয়েছে যে, আমি একবার স্বপ্নে দেখি, যেন একটি সবুজ শ্যামল ফুল বাগানে রয়েছি। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে একটি লোহার স্তম্ভ রয়েছে যা ভূমি হতে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে। এর চুড়ায় একটি আংটা রয়েছে। আমাকে এর ওপরে যেতে বলা হয়। আমি বলি যে, আমি তো উঠতে পারবো না। অতঃপর এক ব্যক্তি আমাকে ধরে থাকে এবং আমি অতি সহজেই উঠে যাই। তারপর আমি আংটিটিকে ধরে থাকি। লোকটি আমাকে বলেঃ খুব শক্ত করে ধরে থাকো। আংটিটি আমি ধরে রয়েছি এই অবস্থায়ই আমার ঘুম ভেঙে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট আমি আমার এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে তিনি বলেনঃ

‘ফুলের বাগানটি হচ্ছে ইসলাম, স্তম্ভটি ধর্মের স্তম্ভ এবং আংটিটি হচ্ছে عُرْوَةُوُثْقَى তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই লোকটি হচ্ছেন ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) । (মুসনাদ আহমাদ -৫/৪৫২, সহীহুল বুখারী-১২/৪১৮/৭০১৪, ১২/৪১৪/৭০১০, ৭/১৬১/৩৮১৩, সহীহ মুসলিম-৪/১৪৯/১৯৩১) এই হাদীসটি সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। (ফাতহুল বারী -৭/১৬১, ২/৪১৮; ৪/১৯৩০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে তিনি সে সময় বৃদ্ধ ছিলেন ফলে লাঠির ওপর ভর দিয়ে মাসজিদে নাবাবীতে এসেছিলেন এবং একটি স্তম্ভের পিছনে সালাত পড়েছিলেন। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলে জান্নাত মহান আল্লাহ্র জিনিস। তিনি যাকে চান তাকেই তথায় নিয়ে যান। তিনি স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন এক ব্যক্তি আমাকে একটি লম্বা চওড়া পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন মাঠে নিয়ে যান। তথায় আমি বাম দিকে চলতে থাকলে তিনি আমাকে বলেনঃ তুমি এই রূপ নও। আমি তখন ডান দিকে চলতে থাকি। হঠাৎ সুউচ্চ পাহাড় আমার চোখে পড়ে। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ওপরে উঠিয়ে নেন। আর এভাবে আমি চূড়া পর্যন্ত পৌছে যাই। তথায় আমি একটি উঁচু লোহার স্তম্ভ দেখতে পাই। এর মাথায় একটি সোনার কড়া ছিলো। আমাকে তিনি ঐ স্তম্ভের ওপর চড়িয়ে দেন। আমি ঐ কড়াটি ধরে নেই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, খুব শক্ত করে ধরছো তো? আমি বলি হ্যাঁ। তিনি সজোরে ঐ স্তম্ভের ওপর পায়ের আঘাত করে বেরিয়ে যান এবং কড়াটি আমার হাতে থেকে যায়। অতঃপর এই স্বপ্নটি আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি বলেন এটা খুব উত্তম স্বপ্ন। মাঠটি হচ্ছে পুনরুত্থানের মাঠ। বাম দিকের পথটি হচ্ছে জাহান্নামের পথ। সুউচ্চ পর্বতটি হচ্ছে ইসলামের শহীদদের স্থান। কড়াটি হচ্ছে ইসলামের কড়া। মৃত্যু পর্যন্ত এটাকে শক্ত করে ধরে থাকো। এরপর ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেনঃ আমার আশাতো এই যে, মহান আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। (মুসনাদ আহমাদ -৫/৪৫২, ৪৫৩, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১২৯১/৩৯২০, সহীহ মুসলিম-৪/১৫০/১৯৩১)

এ আয়াত দীনের পরিপূর্ণতার বর্ণনা। দীন ইসলাম তার সুস্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণসহ একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا)

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।” (সূরা মায়িদাহ ৫:৩)

তাই বলা হয়েছে, কাউকে দীন ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না। বরং আল্লাহ তা ‘আলা যার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন, সে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপরেই ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যার অন্তর অন্ধ করে দেয়া হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিতে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে সে হতভাগা।

তবে এ আয়াত বহাল আছে, না রহিত হয়ে গেছে তা নিয়ে ৭টি মত পাওয়া যায়। যা ইমাম শাওকানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল কাদীর, ১/৩৭৪) সঠিক কথা হল আয়াতটি রহিত হয়নি। (তাফসীরে সাদী) তাই ইসলাম কাউকে স্বীয় ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। সেজন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের শত্র “দের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গেলে প্রথমে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেন। দাওয়াত কবূল না করলে জিযিয়া দিতে বলতেন। জিযিয়া দিতে অবাধ্য হলে আল্লাহ তা ‘আলার নাম নিয়ে যুদ্ধ করতেন। (সহীহ মুসলিম হা: ৪৭৩৯) তবে ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ মুরতাদ হলে তাকে ছাড় দেয়া হবে না।

(فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ)

‘সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে’ তাগুত শব্দটি (طغيان) তুগইয়ান থেকে গৃহীত, যার অর্থ হলো সীমা অতিক্রম করা। তাগুত বলা হয়: প্রত্যেক বানানো মা ‘বূদ ও যার আনুগত্য করতঃ বান্দা সীমা অতিক্রম করে তাকে।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন: তাগুত হল প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার ইবাদত করা হয় এবং সে সেই ইবাদাতে খুশি। সুতরাং যে সকল ব্যক্তিদের ইবাদত করা হয় এবং তারা যদি সে ইবাদতের দিকে আহ্বান করে ও সন্তুষ্ট থাকে তাহলে এরা সবাই তাগুত। তাগুতের অনেক প্রকার রয়েছে; তবে প্রধান তাগুত পাঁচটি.....? তাই

যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির বলবে না অথবা তারা কাফির এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করবে সে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল না।

ঈমান দু' টি বিষয় ছাড়া অর্জিত হয় না, ১. তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে। ২. আল্লাহ তা 'আলার প্রতি ঈমান আনতে হবে।

তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ হলো: আল্লাহ তা 'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা, তা অপছন্দ করা, অস্বীকার করা, তার সাথে শত্র "তা পোষণ করা এবং যারা গায়রুল্লাহর ইবাদত করে তাদের সাথে শত্র "তা পোষণ করা। এটাই হলো তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ আল্লাহ তা 'আলার প্রতি ঈমান আনা। তাগুতকে অস্বীকার ও আল্লাহ তা 'আলার প্রতি ঈমান এ দু' টি বিষয় মানলে একজন ব্যক্তি মুওয়াহহিদ (তাওহীদ বা আল্লাহ তা 'আলার এককত্বে বিশ্বাসী) হবে।

অতএব সকল প্রকার তাগুত অস্বীকার ও বর্জন না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না। যদি কেউ তাগুতের ওপর বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা 'আলার প্রতিও বিশ্বাস করে সে কখনো মু' মিন হতে পারে না।

(بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى) মজবুত রশি অর্থ কী? এ নিয়ে কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়:

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বিন যুবাইর ও যাহহাক (রহঃ) বলেন: শক্ত রজ্জু হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

২. আনাস (রাঃ) বলেন, শক্ত রজ্জু হল কুরআন।

৩. মুজাহিদ বলেন: শক্ত রজ্জু হল ঈমান।

৪. সুদ্দী বলেন: তা হল ইসলাম। এছাড়াও অনেক তাফসীর পাওয়া যায়। সকল তাফসীরের অর্থ একটি অর্থের দিকেই ফিরে যায় তা হল দীন ইসলাম। (তাফসীর কুরতুবী ২/২১৫)

সুতরাং যে ব্যক্তি সকল প্রকার তাগুত বর্জন করে এক আল্লাহ তা 'আলার প্রতি ঈমান আনবে, মাঝে কোন মধ্যস্থতা অবলম্বন করবে না, আল্লাহ তা 'আলার প্রতি বিশ্বাসের সাথে তাগুতের প্রতি বিশ্বাস রাখবে না সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করবে যা আল্লাহ তা 'আলা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, তা ছিঁড়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে না।

এখানে দ্বীন বলতে ওপরের আয়াতে বর্ণিত আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা ও সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ‘ইসলাম’ এর এই আকীদাগত এবং নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।

আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ‘তাগুত’ বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা লংঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহর মোকাবিলায় বান্দার প্রভুত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ফাসেকী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফরী। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এই শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায় তাকেই বলা হয় ‘তাগুত’। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন দিন সঠিক অর্থে আল্লাহর মু’মিন বান্দা হতে পারে না।

[১] কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, দ্বীন গ্রহণে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ দ্বীন ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে? একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হত, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধ ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

(وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا)

“তারা জমিনে ফাসাদ করে বেড়ায় , কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না”। [সূরা আল-মায়িদাহ ৬৪] এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী যালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য। ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের এ কার্যপদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও যুদ্ধের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায় অনাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ-যুদ্ধের নির্দেশ (لَآاِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ) আয়াতের পরিপন্থী নয়। আবার কোন কোন নামধারী মুসলিম ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদেরকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে

তারা - “দ্বীন সম্পর্কে জোরজবরদস্তি নেই" -এ অংশটুকু বলে। তারা জানে না যে, এ আয়াত দ্বারা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি শুধু তাদেরকে জোর করে ইসলামে আনা যাবে না বলা হয়েছে। কিন্তু যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে, তারা ইসলামের প্রতিটি আইন ও যাবতীয় হুকুম-আহকাম মানতে বাধ্য। সেখানে শুধু জোর-যবরদস্তি নয়, উপরন্তু শরীআত না মানার শাস্তিও ইসলামে নির্ধারিত। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় আইন মানতে বাধ্য করানো অন্যান্য মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। যেমনটি সিদ্দীকে আকবর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

[২] ‘তাগূত’ শব্দটি আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী বা নির্ধারিত সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় তাগুত বলা হয়ে থাকে এমন প্রত্যেক ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তাকে, যার ব্যাপারে ইবাদতকারী বা অনুসরণকারী অথবা আনুগত্যকারী তার বৈধ সীমা অতিক্রম করেছে আর ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে বা সেদিকে আহবান করেছে। [ইবনুল কাইয়্যেম: ইলামুল মু'আক্কোয়ীন] সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, তাগুত এমন বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভূ ও ইলাহ হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে।

আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় বান্দার প্রভূত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ‘ফাসেকী’ । দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আল্লাহ্‌র শাসন-কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় ‘কুফর ও শির্ক’ । তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এ শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌছে যায়, তাকেই বলা হয় তাগুত।

এ ধরণের তাগুত অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাগুত ওলামায়ে কেরাম পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন। (এক) শয়তান, সে হচ্ছে সকল প্রকার তাগূতের সর্দার। যেহেতু সে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদাত থেকে বিরত রেখে তার ‘ইবাদাতের দিকে আহবান করতে থাকে, সেহেতু সে বড় তাগূত। (দুই) যে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে বলে দাবী করে বা অদৃশ্যের সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। যেমন, গণক, জ্যোতিষী প্রমূখ। (তিন) যে আল্লাহ্‌র বিধানে বিচার ফয়সালা না করে মানব রচিত বিধানে বিচার-ফয়সালা করাকে আল্লাহ্‌র বিধানের সমপর্যায়ের অথবা আল্লাহ্‌র বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে থাকে। অথবা আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিবর্তন করে বা মানুষের জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে। (চার) যার ইবাদাত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট। (পাঁচ) যে মানুষদেরকে নিজের ‘ইবাদাতের দিকে আহবান করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনায় পাঁচ প্রকার তাগূতের পরিচয় তুলে ধরা হলেও তাগূত আরও অনেক রয়েছে। [কিতাবুত তাওহীদ]

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত নীতিমালার আলোকে আমরা সকল প্রকার তাগূতের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হব।

[১] আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যত তথা প্রভূত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করা।

[২] আল্লাহ্‌র উলুহিয়াত বা আল্লাহ্‌র ইবাদাতকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করা। এ হিসেবে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য যেমন, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, জীবিতকরণঃ, মৃত্যুদান, বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকরণঃ, হালাল হারামের বিধান প্রবর্তন ইত্যাদিকে যে ব্যক্তি নিজের জন্য দাবী করবে সে তাগূত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌কে ইবাদাত করার যত পদ্ধতি আছে যে ব্যক্তি সেগুলো তার নিজের জন্য চাইবে সেও তাগূত । এর আওতায় পড়বে ঐ সমস্ত লোকগুলো যারা নিজেদেরকে সিজদা করার জন্য মানুষকে আহবান করে। নিজেদের জন্য মানত, যবেহ্‌, সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদির আহবান জানায়।

[৩] তাগূতকে অস্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তাগূত নেই বলে বিশ্বাস পোষণ করা। বরং তাগূতকে অস্বীকার করা বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌র ইবাদাত ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত না করা এবং এ বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্‌র ইবাদাত ছাড়া সকল প্রকার ইবাদাতই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আর যারা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যে কোন কিছু তাদের জন্য দাবী করে থাকে তাদেরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এ বিশ্বাস করা যে তাদের এ ধরণের কোন ক্ষমতা নেই।

[৪] ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সে জন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধবংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার ।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না, দাওয়াত দেয়ার পর কবূল না করলে মুসলিমদের অধীনে থেকে জিযিয়া দিতে হবে।

২. ইসলাম একমাত্র সঠিক ধর্ম যা সুপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. তাগুত বর্জন করা ছাড়া মু’ মিন হওয়া যায় না।

৪. সঠিক পথ ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র রজ্জু দীন ইসলাম, যা কেউ ধারণ করলে পথভ্রষ্ট হবার আশংকা নেই।